

সচেতন বার্তা

২য় বর্ষ □ ৭ম সংখ্যা □ সেপ্টেম্বর ২০১৭



এ সংখ্যায় যারা লিখেছেন

■ মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীর ভূমিকা

ড. আলেয়া পারভীন

■ শৈনিকক্ষে শিশুবান্ধব পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা

ড. ফিরোজা বেগম

■ জীবনযাত্রায় আইসিটি

এস. এম. আতিকুর রহমান

মহান মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি নারীর ভূমিকা

ড. আলেয়া পারভীন*



বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মানুষ হিসেবে নারীর জীবন অধ্যয়নের একটি বড় দিক। এই যুদ্ধে নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নারী তার সর্বাঙ্গিক শক্তি নিয়োগ করেছিল স্বাধীনতার মতো একটি বড় অর্জনে। পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ ছিল তার জীবনবাজি রাখার ঘটনা। ড. নিবেদিতা দাশ পুরকায়স্থ বলেন, “অধিকার আদায়, সামাজিক অবরোধ মুক্তি ও শোষণের বিরুদ্ধে জীবন বাজী রেখে লড়েছেন নারীরা। তাঁরা জেলে গেছেন, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন, পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেছেন, দুর্জয় প্রতিরোধের ঘাঁটি তৈরি করে চারিদিক আলোড়িত করেছেন অসীম সাহসে।”^১ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের নারীদের ভূমিকা এমনই ছিলো। পুরুষদের পাশাপাশি নারীরাও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যে অসামান্য রাখেন তা আরো গভীরভাবে জানা প্রয়োজন। যদিও মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ বিষয়ে গবেষণা পর্যায়ে অল্প-বিস্তর কাজ হয়েছে তথাপি নারীযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে গুটিকয় নারী। তাই বর্তমান আলোচনায় মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণকে প্রস্তুতি পর্ব ও অংশগ্রহণ পর্ব এ দুভাগে ভাগ করে তাদের ভূমিকা তুলে ধরা হল।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের প্রস্তুতি পর্ব : মুক্তিযুদ্ধে প্রস্তুতি পর্বের প্রথম বিষয় ছিল নারীদের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। যেমন :

অস্ত্র প্রশিক্ষণ : ছাত্র ইউনিয়নই প্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ত্র প্রশিক্ষণের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে। সিদ্ধান্ত মতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাডেট কোরের রুম থেকে এবং আরমানিটোলা স্কুলের তালা ভেঙে বস্তা ভরে ডার্মি রাইফেল নিয়ে আসা হয়। এখানে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আবুল কাশেম মিয়া ও মুনিরুজ্জামান। নারীদের বিদ্রোহ কমান্ডার হিসেবে কাজ করেন রোকেয়া কবীর।

মরিচা হাউজ ও প্রশিক্ষণ : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে সাজেদা চৌধুরীর কলাবাগানের বাসা মরিচা হাউজ এর সামনে মিসেস টি. এন. রশিদের পরিচালনায় উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে নার্সিং ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা দেওয়া হতো। এখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা ডার্মি রাইফেল হাতে করে ২৩ মার্চ তারিখে মার্চপাস্ট করে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বর রোডের বাড়িতে যান এবং তাঁর হাতে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা হস্তান্তর করেন।

বেবী মওদুদের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ : ঢাকায় মেয়েদের আরেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বেবী মওদুদের তত্ত্বাবধানে। এটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে বেবী মওদুদের উদ্যোগে ধানমন্ডিতে একটি কমিটি গঠিত হয়। এতে বেবী মওদুদ ছাড়াও মাসুদা মতিনসহ আরও কয়েকজন মহিলা অন্তর্ভুক্ত হন। তারা ঘরে ঘরে মহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে বর্তমান সুলতানা কামাল মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের পাশের একটি বাড়িতে জমায়েত করেন।

ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলে প্রশিক্ষণ : মার্চে ধানমন্ডি গার্লস হাইস্কুলেও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটির আয়োজন করেছিল ধানমন্ডির বিভিন্ন ব্লকের তরুণ ছেলেরা। এখানে প্রশিক্ষণ দেন তরু নামের একজন প্রশিক্ষক। হোসনে আরা ইসলাম ধানমন্ডি থেকে এবং নূরুন্নাহার ফয়জুল্লাহ নীলক্ষেত থেকে আরও অনেক মেয়েকে এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নিয়ে

* পুরকায়স্থ, ড. নিবেদিতা দাশ, মুক্তিযুদ্ধে নারী, পিপ ট্রাস্ট, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৯।

আসতেন বলে জানা যায়।

কিশোরী, যুবতী ও বয়স্ক মহিলাদের সংগঠিত করা : ঢাকায় ছাত্র ইউনিয়ন এবং মহিলা পরিষদের কর্মীগণ বিভিন্ন এলাকার বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে কিশোরী, যুবতী ও বয়স্ক মহিলাদের সংগঠিত করেছেন এবং প্রায় প্রতিদিন বিকেলে আত্মরক্ষা, ফাস্ট এইড, ফিজিক্যাল ফিটনেস, মার্চপাস্ট, ট্রেঞ্জ করা প্রভৃতি প্রশিক্ষণ দিয়েছেন।

প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ব্যাপক হারে নারীগণ প্রশিক্ষণের আওতায় এসেছেন। সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত নন, এমন কেউই প্রথমদিকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের কথা ভাবেননি, তবে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রাজনীতির সাথে কোনই সংস্পর্শ নেই এমন নারীদেরও প্রশিক্ষণ গ্রহণে আগ্রহ লক্ষ্য করা গেছে। কেউ কেউ নিজের জন্য একটি নিরাপদ অবস্থান খুঁজে নেওয়ার প্রয়োজনেও প্রশিক্ষণ ক্যাম্পের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

গোবরা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত : মে মাস থেকে কলকাতার পদ্মপুকুর আর পার্ক সার্কাসের মধ্যবর্তী তিলজরা এলাকায় কেবল নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য গোবরা ক্যাম্প প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ক্যাম্পের দায়িত্ব পালন করেন সাজেদা চৌধুরী। এ প্রশিক্ষণটির অন্তর্ভুক্ত ছিল প্রাথমিক চিকিৎসা, পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশন, মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ প্রভৃতি। গোবরায় প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় জাতীয় সংগীত গাওয়া হতো। সকালে পিটি প্যারেড এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা কোন কোনদিন রাত পর্যন্ত ক্লাস হতো। ক্লাসে মূল বিষয়ের বাইরেও দেশ, রাজনীতি, ইতিহাস, সংগ্রামী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জীবনালোচনা, মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান দেওয়া হতো।

প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদান : প্রশিক্ষক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন ডাঃ লাল, ডাঃ ব্রজ্জচারী, মীরা দেবী, ক্যাপ্টেন এস. এম. তারেক, সেবা চৌধুরী ও শিপ্রা সরকার। প্রথম দু'টি ব্যাচে এখানে ১৬ জন করে ৩২ জন নারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিভিন্ন হাসপাতালে ও ফ্রন্টে সেবা ও অন্যান্য কাজে নিয়োজিত হন। তৃতীয় ব্যাচে আরও ১৬ জন নারী প্রশিক্ষণ নিলেও তাদের প্রশিক্ষণ শেষ করে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত হওয়ার আগেই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

পরিষদ গঠন : ষাটের দশকে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অনেক নারী ছিলেন। এদের মধ্যে অনেকেই ছাত্রজীবন শেষ করে মহিলা পরিষদ গড়ে তুলেছিলেন। এদের সিংহভাগই ছিলেন ছাত্র ইউনিয়ন তথা প্রগতিশীল ও রাজনীতির সাথে যুক্ত। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ, কৃষক সমিতির যৌথ পরিচালনায় গেরিলাবাহিনী গড়ে তোলা হয়।

জনগণের সমর্থন সংগ্রহ : বামপন্থীদের মূল কেন্দ্র ছিল আগরতলা। এখানে থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী নেত্রী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সারা বিশ্বের নারী আন্দোলনের সমর্থন আদায়, ভারতব্যাপী জনগণের সমর্থন সংগ্রহের জন্য জনসভায় যোগদান, বিভিন্ন রিফিউজি ক্যাম্প ঘুরে মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ, বিভিন্ন গেরিলাযুদ্ধে যোগদানকারীদের রাজনৈতিক ওরিয়েন্টেশন প্রদান, বিভিন্ন ক্যাম্পে স্কুল পরিচালনা, আহত মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা ও নার্সিং ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিবিষ্ট ছিলেন।

উইমেন্স কো অর্ডিনেটিং কাউন্সিল গঠন : কলকাতায় উইমেন্স কো অর্ডিনেটিং কাউন্সিল নামে একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল, যার আওতায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তৎপর হওয়ার জন্য নারীদের নার্সিং প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। এ সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন রেনুকা দেবী এবং সেক্টর ইনচার্জ ছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জী। বাংলাদেশের পক্ষে এ কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন সাজেদা চৌধুরী। আর প্রশিক্ষক ছিলেন 'খাতুনাদি' নামে পরিচিত ড. লুৎফুন্নেসা খাতুন। কেন্দ্রটি ৪০ জন করে একাধিক ব্যাচে নারীদের নার্সিং প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ পর্ব : মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অংশগ্রহণ পর্বে দেখা যায় যুদ্ধে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ, যেমনঃ

যুদ্ধসংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরে কর্মরত : বাংলাদেশের নারীসমাজ একান্তরের মুক্তিযুদ্ধে পুরুষ যোদ্ধাদের মতই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সকল সেক্টরে কর্মরত ছিল। সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে শুরু করে, গোপন তথ্য আনয়ন, কূটনৈতিক দায়িত্ব

পালন পর্যন্ত সকল ধরনের কাজেই তাদের অবদান ছিল। এর পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধে আরও অবদান নারীরা রেখেছেন, তার কোনটিকেই ছোট করে দেখার অবকাশ নেই। নারীরা তাদের যথাসাধ্য শ্রম দিয়ে, মানসিক সমর্থন দিয়ে দেশকে রক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন।

যুদ্ধে পরামর্শ ও প্রণোদনা দান : যুদ্ধে প্রণোদনা দান, পরামর্শ দান, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রক্রিয়ার নিয়ন্ত্রণ এবং ব্যাপকভাবে যোদ্ধাদের সংগঠিত করায় নারীরা সক্রিয় ছিলেন একান্তরকম স্বাধীনতা যুদ্ধে। এ কাজে প্রধানত পুরুষগণই ব্যাপকভাবে তৎপর থাকলেও নারীদের কয়েকটি দৃষ্টান্ত সুধী সমাজের অনুসন্ধান মিলেছে। যুদ্ধে পরামর্শ ও প্রণোদনা দানের কাজটিতে দেশব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের মানসিকতাসম্পন্ন প্রায় প্রতি ঘরেই নারীরা যুক্ত হন। নারীদের এ মৌন সম্মতি মুক্তিযুদ্ধকে আরও বেগবান করে তোলে।

যোদ্ধাদের সংগঠিতকরণে : যোদ্ধাদের একত্রীকরণ ও সংগঠিতকরণে শিক্ষিত ও রাজনীতিসচেতন নারীগণ ছিলেন অক্লান্ত। কেবল নারীদের মধ্যে নয়, সংগঠিতকরণের কাজে নারীগণ নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর মধ্যে কাজ করে থাকে। এ কাজে সারাদেশেই অসংখ্য নারী সক্রিয় হয়েছিলেন বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের মাধ্যমে। যেমন- মুক্তি সংগ্রামী শিল্পী সংস্থা, তুলি কলম কণ্ঠ প্রভৃতি। এসব সংগঠন কেবল মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্বুদ্ধকরণের কাজটিই করেনি, বরং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে আহত যোদ্ধাদের চিকিৎসা ও শরণার্থীদের বেঁচে থাকতে সহযোগিতা করেছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠায় নারীদের অবদান ছিল অসামান্য। এটি প্রতিষ্ঠা পরবর্তী সময়ে স্বাধীন বাংলা বেতারের নিয়মিত কর্মী বেগম মুশতারী শফীর অবদান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্ব দিকে এর সাথে বিভিন্নভাবে জড়িত নারীদের মধ্যে আরও ছিলেন ডাঃ মঞ্জুলা আনোয়ার, অধ্যাপক তমজিদা বেগম প্রমুখ। এর পরবর্তী সময়ে অসংখ্য নারী ও বেতারের সাথে যুক্ত হন ও নিয়মিত অনুষ্ঠান প্রচারে অংশগ্রহণ করে থাকে।

৩০ মার্চ সাড়ে সাতটায় বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা ঘোষণা করে যে টেলিগ্রাম দিয়েছিলেন তার বাংলা ও ইংরেজি তর্জমা প্রচার করা হয়েছিল। ইংরেজি থেকে তর্জমা করেছিলেন ড. মঞ্জুলা আনোয়ার।^২ ঘোষণাটি পাঠ করেছিলেন কাজী হোসেন আরা।^৩ এছাড়া বিপ্লবী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক প্রথম দশজন সংগঠন কর্মীর মধ্যে একমাত্র নারী ছিলেন ডঃ বেগম মুশতারী শফি।^৪

বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে বেতার কেন্দ্রের অবদান অনস্বীকার্য। কেননা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান এদেশের মানুষকে মুক্তির লক্ষ্যে এগিয়ে নিয়েছে; অনুপ্রেরণা জাগিয়েছে। আর এক্ষেত্রে নারীরা তাদের জীবনের মায়া ত্যাগ করে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এদের মধ্যে- বুলবুল মহলানবিশ, নাজনীন নীনা, কল্যাণী ঘোষ, রূপা ফরহাদ, ফ্লোরা আহমেদ, মঞ্জুলা দাশগুপ্তা, জারীন (নাছরীন) আহম্মদ শিলু, আইতি রহমান, রত্না ঘোষাল, কুলসুম আসাদ, দিল্লী লোহানী, শওকত আরা আজিজ, বাসনা গুণ, পারভীন আক্তার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।^৫

পত্রিকা প্রকাশ : ঢাকা শহরের সাংবাদিক সেলিনা পারভীন ‘শিলালিপি’ নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এর সর্বশেষ সংখ্যার প্রচ্ছদে ছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা। তিনি নিজে কবিতা ও কলাম লিখতেন এবং বাম রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। যুদ্ধকালে যোদ্ধাদের তিনি তার বাসায় খেতে, আর্থিক সাহায্য ও আশ্রয় দিয়েছেন। তাদের তিনি খাবার ও ঔষধ প্রদান করে সহযোগিতা করেছেন। তার এসব ভূমিকা তাকে একজন দেশপ্রেমিক ও স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। ১৩ ডিসেম্বর তারিখে তাকে অপহরণ করে নিয়ে রায়েরবাজার ইটাখোলার বধ্যভূমিতে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। সাংবাদিকতায় তার ন্যায় আরও অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাহসী ভূমিকা রেখেছেন।

আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহ দিয়ে : ধনী পরিবারের নারীদের মত দরিদ্র পরিবারের নারীরাও ক্ষুধার্ত মুক্তিযোদ্ধাদের নিজের সন্তানের ন্যায় যত্ন করে খাইয়েছেন, আশ্রয় দিয়ে মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সারাদেশের অসংখ্য পরিবার মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও খাদ্য সরবরাহ না করলে আমাদের যোদ্ধাদের দ্বারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে বীরদর্পে যুদ্ধ করা সম্ভব হতো না। নারীরা নিজেদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করে ঔষধ ক্রয়

^২ আখতার, ফরিদা, মহিলা মুক্তিযোদ্ধা (সম্পাদিত), পৃ. ৯৯-১০৩।

^৩ কবির, নায়লা, প্রাগুক্ত।

^৪ প্রাগুক্ত।

^৫ প্রাগুক্ত।

করেছেন। কখনওবা সরকারি হাসপাতাল থেকে গোপনে ঔষধ সরিয়েছেন। আবার কখনওবা দোকান থেকে বাকীতে বা বিনে পয়সায় ঔষধ সংগ্রহ করেছেন। কাজেই ঔষধ সংগ্রহ, আশ্রয় ও খাদ্যদানের এসব ঘটনা যোদ্ধাদের কর্তব্য সচল রাখারই নেপথ্য ইন্ধন।

অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে নারী : গোপনে অস্ত্রশস্ত্র সংরক্ষণ ও যথাস্থানে তা সরবরাহ করা এবং বিভিন্ন যুদ্ধস্থলের মধ্যে বার্তা আদানপ্রদানের ন্যায় ঝুঁকিপূর্ণ ও জটিল কাজে নারীরা সীমাহীন পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। আর্থ-সামাজিক কারণে ব্যাপকভাবে নারীরা সম্মুখযুদ্ধে অংশ নিতে না পারলেও তারা প্রাণবাজি রেখে যুদ্ধের যাবতীয় রসদ সংরক্ষণ ও সরবরাহ করে নারীরা মুক্তিবাহিনীর যুদ্ধজয়ের নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন।

তথ্য সংগ্রহ ও আদানপ্রদান : তথ্য সংগ্রহ এবং তার আদানপ্রদানের কাজে নারীরা পুরুষের চেয়েও অধিক দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন বারবার। যুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপটে এমন কিছু তথ্য থাকে, যা যথাস্থানে না পৌঁছালে শত শত যোদ্ধার জীবন বিপন্ন হয়ে পড়তে পারে। কাজেই যে কোন যুদ্ধে বার্তাবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ হিসেবে চিহ্নিত হয়। অশেষ গুরুত্বপূর্ণ এ কাজে নারীরা বারবারই সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। সারাদেশে এমন বার্তাবাহক নারীর সংখ্যা অসংখ্য।

নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ : একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় ও ভারতের সীমান্ত এলাকায় নারীরা নার্সিংয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এসবের অধিকাংশই আয়োজিত হয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলোর উদ্যোগে। কিন্তু কোন ধরনের প্রশিক্ষণ ছাড়াই সারাদেশে আরও অজস্র নারী সেবাকাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। নারীদের একটি বড় গুণ সেবাপরায়ণ মানসিকতার অধিকারী হওয়া। সারাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চিকিৎসক নারীদের মধ্যে যে যেখানে কর্মরত ছিলেন, সেখানেই তারা যোদ্ধাদের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

৬ প্রাপ্তক।

৭ প্রাপ্তক।

৮ প্রাপ্তক।

৯ প্রাপ্তক।

১০ প্রাপ্তক।

সশস্ত্র যোদ্ধা নারী : সশস্ত্র যোদ্ধা যে নারীও হতে পারেন, এ সত্যটি ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই, মহারানী অবন্তীবাই লোধী, সশস্ত্র বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদেদার, টঙ্ক বিদ্রোহী বীরকন্যা রাসমনি হাজং-এর উদাহরণ সামনে থাকতেও পুরুষপ্রধান এ সমাজ তা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। যেসব নারীরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা করেছিল। কেননা বাংলাদেশের মেয়েরা কলকাতার গোবরা ক্যাম্পে আওয়ামী লীগ নেত্রী সাজেদা চৌধুরীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিয়েছিল।^৬ বীর রোশেনারা বুকে মাইন বেধে পাকবাহিনীর ট্যাঙ্কের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের কিশোরী দেহের সঙ্গে একটি আস্ত-প্যাটন ট্যাঙ্কেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রী জিন্নাত আরা প্রত্যক্ষ অপারেশনে অংশ নিতে গিয়ে তার দুটি পা-ই হারান, বর্তমানে তিনি পঙ্গু। পাবনার শিরিন বানু মিতিল পুরুষের বেশে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশ নেন। যুদ্ধের প্রথম ভাগে তিনি কন্ট্রোল রুম পাহারা দিতেন, রাইফেল হাতে টহল দিতেন সীমান্তবর্তী এলাকায়, পুরুষের পাশে পুরুষ পরিচয়েই ঘুমাতে।^৭ যুদ্ধের পরবর্তী ভাগে মেজর জলিল কর্তৃক গঠিত নারী বাহিনীতে তিনি যোগ দেন। এ বাহিনীতে তার সাথে আরো কাজ করতেন বিভা সরকার, যুথিকা, মনিকা ব্যানার্জী, ইরা, জিন্নাত, বিভা, নাজমা ও সাজেদা।^৮ এছাড়া তারামন বিবি সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ক্যাপ্টেন সিতারা পারভীনও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান নড়াইলের লোহাগড়া অঞ্চলে নৌবিভাগের প্রাক্তন অফিসার সামসুল আলমের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী মুক্তিবাহিনী গড়ে উঠেছিল যেখানে ১১ জন মেয়ে নিয়ে গঠিত নারী বাহিনীও ছিল।^৯ এছাড়া ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে আগরতলায় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের সেবা গুরুত্ব করেছেন ৫০ জনের অধিক এক নারী বাহিনী। এদের মধ্যে ছিলেন সুলতানা কামাল, সাইদা কামাল, ড. ডালিয়া সালাউদ্দিন, মিনু বিলুগাহ, খুকু আহমেদ, রেশমা, গীতা মজুমদার প্রমুখ। পশ্চিম বাংলার কল্যাণী ক্যাম্পে ড. সুলতানা জামানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মেয়েরা বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণ ও শিশুদের দেখাশোনা করেন।^{১০} ১৪ ডিসেম্বর এদেশের সেরা বুদ্ধিজীবী অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পীদের হত্যা করা হয়, পাকবাহিনীর দোসর রাজাকার-আলবদর গোষ্ঠী কর্তৃক। ফলে নিহত হন কবি মেহেরুল্লাহ ও সাংবাদিক সেলিনা পারভীন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে এদেশের নারীরা বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। “মুক্তিযুদ্ধে নারী” নামক একটি অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধে যথার্থই বলা হয়েছে, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে নারী যোদ্ধারা

পুরুষের মতোই যুদ্ধ সংশ্লিষ্ট সকল সেষ্টেরে কর্মরত ছিল। সশস্ত্র যুদ্ধ থেকে শুরু করে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন পর্যন্ত সব ধরনের ক্ষেত্রেই নারীদের অবদান ছিল।

মুক্তিযুদ্ধে নারীর ইতিহাস নারী অধ্যয়নে প্রতিফলিত হতে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৪৫ বছর পেরিয়ে গেলেও আমরা এখনও নারী জীবনের অনুপুঞ্জ বিবরণ এবং গভীর মাত্রা সামনে তুলে ধরতে পারিনি। ফলে নারী অধ্যয়নের বিষয়টি এখনও উপরি-অধ্যয়নের বিষয় হিসেবেই অনেকটা বিবেচিত। কাজেই সময় এসেছে বাংলাদেশের নারীর জীবনকে অস্পষ্ট ছায়ার মতো না দেখে আলোকময় করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার।

*সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

শ্রেণিকক্ষে শিশুবান্ধব পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা

ড. ফিরোজা বেগম*



শিক্ষার্থীরা স্কুলে আসে পড়াশোনা করতে। এই প্রেক্ষিতে তাদেরকে সেখানে দিনে একটি নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত করতে হয়। সেখানে তারা নিয়মতান্ত্রিকভাবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী শিক্ষা অর্জন করে। এই জ্ঞানার্জন যেন গুণগত এবং মানসম্পন্ন হয় যা তাদের পরবর্তী জীবনে কার্যকরী হয় অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জীবনে কাজে লাগিয়ে তাদের জীবনকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলতে পারে। এই উদ্দেশ্যে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা একটি অন্যতম জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বলাবাহুল্য যে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা যাতে উৎসাহ, উদ্দীপনা ও মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া ও জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করতে পারে সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে। এই লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি অনুসরণে শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ ও বন্ধু ভাবাপন্ন শ্রেণিকক্ষ তৈরী করা প্রয়োজন। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষ হতে হবে শিশুবান্ধব।

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ : শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ এমন হওয়া প্রয়োজন :

- * যেখানে শিশুরা নিরাপদ ও আরাম বোধ করে।
- * যেখানে শিশুরা নিজেদের মত করে চিন্তা করতে পারে।

- * যেখানে শিক্ষকরা সকল শিশুদের খেয়াল রাখেন।
- * যেখানে প্রতিটি জিনিষ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি করে সাজানো, দেখতে সুন্দর এবং আকর্ষণীয়।
- * যেখানে নানাধরনের খেলনা আছে এবং তা ব্যবহারের সুযোগ আছে।
- * যেখানে শিক্ষকরা শিশুদের সৃজনশীলতা বিকাশের জন্য উৎসাহ দিবে।

অনেক সময় শিক্ষার্থীরা অযৌক্তিক কার্যকলাপ করে থাকে যা তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে। শিক্ষার্থীদের এমন অযৌক্তিক আচরণের উদ্দেশ্য নির্ভর করে শিক্ষকের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার উপর। শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের অযৌক্তিক কার্যকলাপের প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে হবে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে এই উদ্দেশ্যরোধের জন্য। শিক্ষকের ইতিবাচক ব্যবহার বা আচরণ শিশুদের নিরাপদ ও বন্ধুভাবাপন্ন শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে।

১. শিক্ষার্থীকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন : শিক্ষকগণকে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি ইতিবাচক পদক্ষেপের জন্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। এই মূল্যায়ন শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করবে।

২. অযৌক্তিক কার্যকলাপ রোধ : শিক্ষার্থীরা যে কোন অযৌক্তিক কার্যকলাপ করতে পারে। শিক্ষকগণ এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দায়ী না করে ঐ সকল কার্যকলাপের দিকে বিশেষ নজর দিবেন এবং তাদেরকে ঐ সকল কার্যকলাপ এড়িয়ে চলার জন্য ধীরে ধীরে উদ্বুদ্ধ করবেন।

৩. শ্রেণিকক্ষের নিয়ম তৈরি : ভালো শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনার জন্য একটি শ্রেণিকক্ষের নিয়মের ছক তৈরি করা যেতে পারে। এই ছকে শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীরা সমন্বিতভাবে উল্লেখ করবেন যে কি কি করা যাবে ও কি কি করা যাবে না। নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে বিবেচনা করে ছকে কি কি থাকবে বা কি কি থাকবে না তা নির্ধারণ করা যেতে পারে, যেমন :

- * কম সংখ্যক নিয়ম হতে হবে
- * সহজ নিয়ম হতে হবে

- * নিয়মগুলোকে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে
- * নিয়মগুলো বয়সের সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে।

শ্রেণিকক্ষে নিয়মের উদাহরণ : শ্রেণিকক্ষের নিয়মগুলো নিম্নরূপ হতে হবে :

- * সময়মত ক্লাসে আসতে হবে।
- * ক্লাসে মনোযোগী হতে হবে।
- * বন্ধুদের কাছে শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।
- * বন্ধুদের সহযোগিতা করতে হবে।
- * কিছু না বুঝলে প্রশ্ন করতে হবে।
- * অনুমতি ছাড়া কথা বলা যাবে না।

৪. আচরণগত নিয়মগুলো স্মরণ করা : নির্দিষ্ট সময় পর পর শিক্ষকগণ ও শিক্ষার্থীদেরকে আচরণগত নিয়মাবলীসমূহকে স্মরণ করতে হবে।

৫. সময়মত ক্লাস পরিচালনা করা : শিক্ষকগণ হলেন শিক্ষার্থীদের জন্য আদর্শ। প্রতিটি কাজের ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষকগণের কার্যকলাপ অনুসরণ করে থাকে। কাজেই ক্লাসে যাওয়ার ব্যাপারে শিক্ষকগণকে সময়ানুবর্তী হতে হবে অর্থাৎ সময়মত ক্লাস পরিচালনা করতে হবে। পরবর্তীতে তা অনুসরণ করে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সময়ানুবর্তীতার আদর্শ গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

৬. প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে : বিভিন্ন কারন এবং পরিস্থিতির জন্য শিক্ষকগণকে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকগণকে প্রতিজ্ঞা করা এবং পালনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

৭. শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজে নিয়োগ করানো : শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল কাজে অংশগ্রহণ করাতে হবে। এতে তাদের সচেতনতা বাড়াবে।

৮. অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা : শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করা দরকার। শিক্ষকদের পাঠ বিষয়ক কার্যকলাপের আয়োজন করতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করতে পারে।

৯. কোমলভাবে সাড়া দেয়া : শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের ক্ষেত্রে শিক্ষকগণকে কোমলভাবে সাড়া দিতে হবে।

১০. শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা : শিক্ষার্থীরা সবসময় এমন শিক্ষক খোঁজে যিনি তাদের সমস্যা বুঝতে পারবে। কাজেই শিক্ষকগণকে বন্ধুত্বপূর্ণ শ্রেণিকক্ষ পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

১১. শিক্ষার্থীদের তাদের নাম ধরে সম্বোধন : শিক্ষককে তার সমস্ত শিক্ষার্থীদের নাম জানতে হবে। এতে শিক্ষার্থীদের মনে দৃঢ় অনুভূতি কাজ করবে। তারা তাদের শিক্ষকদের ভালবাসতে শুরু করবে এবং খুবই খুশি হবে।

১২. কম আদেশ : শিক্ষার্থীরা আদেশ পছন্দ করে না। যারা জোড় করে কিছু করানোর চেষ্টা করে শিশুরা তাদের পছন্দ করেনা। তাই শিক্ষার্থীদের কম আদেশ দিতে হবে। কিন্তু আদেশ কম দিলেও কৌশলে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়ার বিষয়ে শিক্ষককে দক্ষ হতে হবে।

১৩. শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না : শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা নিয়ে শিক্ষকের সমালোচনা করা যাবে না। অনেক শিশুর মাঝে তাদের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দাঁত, চুল, গায়ের রং, উচ্চতা ইত্যাদি নিয়ে সমস্যা থাকতে পারে। শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন অন্য কেউ এই সকল সমস্যা নিয়ে কোন সমালোচনা করতে না পারে।

১৪. আনন্দ বজায় রাখা : শিশুরা সবসময় আনন্দ পেতে পছন্দ করে। যদি তারা দেখে যে তাদের শিক্ষক মলিন চেহারা নিয়ে ক্লাস নিচ্ছে, তাদের অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা কমে যায়। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ব্যাপারগুলো শিক্ষার্থীদের সামনে যেন না আসে। শিক্ষক যেন সবসময়ই হাসি-খুশি থাকেন ক্লাসে।

১৫. ‘আমাদের’কে প্রশংসা করা : শিক্ষকগণকে শিক্ষার্থীদের প্রশংসা করতে হবে এবং তাদের মধ্যে ‘আমাদের’ অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে। শিক্ষার্থীদের ‘আমার ক্লাস’, ‘আমার স্কুল’ ইত্যাদির বদলে ‘আমাদের শ্রেণিকক্ষ’ ‘আমাদের স্কুল’ বলতে হবে। এভাবে মালিকানা সম্পর্কিত অনুভূতি গড়ে উঠবে শিক্ষার্থীদের মাঝে, তাদের শ্রেণিকে নিয়ে, স্কুলকে নিয়ে।

১৬. ‘করা যাবে’ ‘করা যাবে না’ পালন করতে হবে : ক্লাস চলাকালীন সময় করণীয় অর্থাৎ কি করা যাবে এবং কি করা যাবে না এর একটি তালিকা প্রণয়ন তৈরি করতে হবে এবং তা ক্লাস চলাকালীন সময় অনুসরণ করতে হবে।

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহ যদি অনুসরণ করা সম্ভব হয় তবে শ্রেণিকক্ষে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত সম্ভব হবে এবং গড়ে উঠবে আত্মবিশ্বাসী, মানসম্মত ও মানবিকবোধসম্পন্ন নতুন প্রজন্ম।

*মনোসামাজিক গবেষক, ঢাকা।

জীবনযাত্রায় আইসিটি

এস. এম. আতিকুর রহমান



বর্তমান যুগ তথ্য প্রযুক্তির যুগ। আধুনিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের ফলে বর্তমানে তথ্য প্রযুক্তি প্রতিটি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এবং তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তি একীভূত হওয়ার ফলে এর প্রতি সকল শ্রেণির মানুষের নির্ভরতা বেড়েছে কয়েকগুণ। কম্পিউটার বা এ জাতীয় কোন ডিভাইস এবং টেলিযোগাযোগের মাধ্যমে অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, প্রেরণ ও গ্রহণ করাই তথ্য প্রযুক্তি। তথ্য প্রযুক্তির সাথে যোগাযোগ প্রযুক্তির নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। এই তথ্য প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ প্রযুক্তির একীভূত প্রয়োগই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বা আইসিটি। প্রযুক্তির যুগোপযোগী ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন দক্ষ আইসিটি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষাক্রমের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত আইসিটি বিষয়টি বাধ্যতামূলক করেছে। যা সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই আবশ্যিক বিষয়।

১৯৮০ সালের পর থেকে পার্সোনাল কম্পিউটার উন্নয়নের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে তথ্য প্রযুক্তির যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালে স্বতন্ত্র তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি খাত আরও এগিয়ে যেতে শুরু করে। বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগের সূচনা ১৯৮৯ সালে ইন্টার এলিয়া (Inter Alia) সেলুলার মোবাইল সেবার মাধ্যমে। তার অনেকটা সময় পরে ১৯৯৭ সালে জাতীয় সফটওয়্যার খাতকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য BASIS এর প্রতিষ্ঠা। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত “রূপকল্প-২০২১”

বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার আইসিটি খাতকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ই-সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৩১ জুলাই, ২০১৩ তারিখে গঠন করেছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর।

বাংলাদেশ সরকারের যথোপযুক্ত উদ্যোগে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রতিশ্রুতি আজ প্রায় বাস্তবায়িত। যার ফলশ্রুতিতে সারাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ইন্টারনেট সংযোগসহ মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম পেয়েছে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীরা এক সময় লাইনের পর লাইনে দাঁড়িয়েও ভর্তি ফর্ম বা ফলাফল পেত না। আজ সেখানে সারাদেশে এক যোগে মুহূর্তের মধ্যে ফর্ম উঠানো, ফলাফল নেওয়া থেকে শুরু করে এ জাতীয় সকল সেবা পাওয়া যাচ্ছে ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

সারাদেশ এখন থ্রিজি মোবাইল ইন্টারনেটের আওতায়। যার ফলে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই মোবাইলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যেকোন তথ্য খোঁজা, ভিডিও কল করা, লাইভ নিউজ জানাসহ ইন্টারনেটের যাবতীয় সুবিধা আজ সকলের হাতের মুঠোয়। দেশের প্রায় সকল ইউনিয়ন পরিষদে খোলা হয়েছে ইউনিয়ন ইনফরমেশন এন্ড সার্ভিস সেন্টার (ইউআইএসসি) যেখানে প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষজন অনলাইনের সকল সেবা পাচ্ছে কম খরচে। এছাড়াও মোবাইল ব্যাংকিং এ অর্থ লেনদেন বাংলাদেশে অর্থ লেনদেন সেবায় এনেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। এর ফলে যখন তখন মোবাইলের মাধ্যমেই টাকা লেনদেন করা যাচ্ছে দেশের যে কোন প্রান্তে এমনকি বিদেশেও।

কর্মক্ষেত্রে যেখানে টেবিলে আগে নথির উপর নথিতে ভর্তি থাকতো; এখন তা সম্পূর্ণ কম্পিউটার নির্ভর। টিকিট বুকিং ও ক্রয় এখন অনলাইন নির্ভর। রেলওয়ে টিকেট, বিমানের ফ্লাইট বুকিং এবং বাসের টিকেট করা যায় এখন ঘরে বসেই। ই-সেবার তালিকায় এখন প্রায় সকল ইউটিলিটি বিল। ফলে ঘরে বসেই যখন তখন পরিশোধ করা যাচ্ছে দেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের পল্লীবিদ্যুৎ বিল, ইন্টারনেট বিল, পানির বিল, এমনকি টেলিফোন বিলসহ সকল ধরনের বিল।

বিশ্ব প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ আজ তৈরি করেছে নতুন নতুন সুবিধা সম্বলিত ব্যবহারবান্ধব কৃষি উপকরণ। প্রযুক্তিসম্পন্ন সেচ পদ্ধতি এবং হাইব্রিড চাষ পদ্ধতিতে আজ বাংলাদেশ অনেক বেশি এগিয়ে।

টেলিযোগাযোগের উন্নয়নের ফলে কৃষক আজ মোবাইলের মাধ্যমেই কৃষি সংক্রান্ত সকল সমস্যার সমাধান পাচ্ছে। কৃষক সমাজকে আরও এগিয়ে নিতে কৃষি প্রযুক্তিতে যোগ করা হয়েছে “কৃষি কল সেন্টারের”। এর মাধ্যমে ১৬১২৩ নাম্বারে ডায়াল করে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান ও পরামর্শ পাওয়া যায়। এছাড়াও রয়েছে “কৃষকের জানালা” নামের অনলাইন ভিত্তিক সেবা। এটি মূলত ফসলের নানা সমস্যার দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমাধান দেওয়ার একটি ডিজিটাল প্রয়াস।

চিকিৎসাক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি উপকরণ আজ বাংলাদেশেও পাওয়া যাচ্ছে, ফলে আমাদের আর বিদেশী চিকিৎসার উপর ততটা নির্ভর করতে হয় না। আজকে আমরা ২৪ ঘণ্টা আমাদের জন্য নিয়োজিত “আমাদের ডাক্তার” বা “মোবাইল হেলথ লাইন ৭৮৯” এ স্বাস্থ্য সেবা পাচ্ছি যখন তখন।

আইসিটির উন্নয়নের ফলে ত্রিশটিরও বেশি দেশে সফটওয়্যার রপ্তানিতে আজ বাংলাদেশ এগিয়ে। যা আমাদের দিচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি। বাংলাদেশে এখন অনলাইন পেশাজীবীর সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বেড়ে চলেছে। প্রযুক্তির অনুকূল পরিবেশ এবং বাংলাদেশ সরকারের দেওয়া নানাবিধ সুযোগের কারণে এটি সম্ভব হচ্ছে। এসব অনলাইন পেশাজীবীরা করমুক্তভাবে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ে আসছেন যা একদিকে আমাদেরকে বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্তি দিচ্ছে অপরদিকে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ব্যাপক সহায়তা করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০২১ সালের মধ্যেই মধ্যম আয়ের দেশ বিনির্মাণে অনন্য সব প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটাতে চান। উন্নত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে প্রজেক্টর ও ভিডিও কলের মাধ্যমে সভা-সেমিনার এবং মিডিয়ার মাধ্যমে তা সরাসরি সম্প্রচার করে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসার যেসকল পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে, তা সুদূরপ্রসারী উদ্যোগ “ডিজিটাল বাংলাদেশ” গড়ে তোলার লক্ষ্যে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত “রূপকল্প-২০২১” বাস্তবায়নের জন্য এই মহান উদ্যোগ সরকার না নিলে বাংলাদেশ আজ কয়েক দশক পিছিয়ে থাকতো বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তিতে।

অতিথি শিক্ষক (আইসিটি)
সরকারি সংগীত কলেজ, ঢাকা।

সম্পাদকীয়

বাঙ্গালি বীরের জাতি। ভাষা আন্দোলন, ছয় দফা, গণ অভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এ স্বাক্ষর রেখেছেন। জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন দেশকে স্বাধীন করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে সারা বাংলার তৎকালীন সাহসী মানুষেরাই আজকের বাংলাদেশ গড়েছেন। তাই সাহসী নতুন প্রজন্ম অব্যাহতভাবে গড়ে উঠুক সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়। জীবন যাত্রায় আসুক ইতিবাচক পরিবর্তন। এই প্রত্যাশায় সাপা’র বর্তমান সংখ্যার আয়োজন।

সম্পাদনা পরিষদ

ড. ফিরোজা বেগম
লেলিন আজাদ
সামসুন্নাহার মনি

লেখা আহবান

সমাজের নানা অসঙ্গতি-বৈষম্য কি আপনাকে ভাবিয়ে তোলে? আপনি কি সামাজিক কুসংস্কার ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দূর করতে বন্ধপরিকর? আপনি কি আপনার লেখনি দ্বারা সচেতন জনসমাজ গড়ে তুলতে চান? তাহলে আপনি যেই হোন, বাংলাভাষায় প্রকাশিত সচেতনতা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা সচেতন বার্তায় লেখা পাঠাতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সাপা’র গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

আপনি কি আপনার প্রতিষ্ঠান বা ঘরে বসেই নিয়মিত ত্রৈমাসিক সচেতন বার্তা পড়তে চান? তাহলে বাৎসরিক দুইশত টাকা প্রদান সাপেক্ষে আজই গ্রাহক হোন। আমরা গ্রাহকদের নিয়মিত কুরিয়ার বা ডাকযোগে সচেতন বার্তা প্রেরণ করে থাকি। বিস্তারিত জানতে আজই যোগাযোগ করুন নিম্ন ঠিকানায়।

সোশ্যাল এওয়ারন্যাস প্রোগ্রাম ফর অল (সাপা)

মধ্যরচর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা থেকে ফজিলাতুন নেসা কর্তৃক প্রকাশিত
মোবাইল : ০১৭১৬০৫৬১৯২
ই-মেইল : apamskd@gmail.com
মূল্য : ২৫ টাকা